বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা

-প্রসূন ঘোষ

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত *বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ* নামক অভিভাষণটিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান মত ব্যক্ত করেছেন।বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য,তার রূপ,পঠনপ্রণালী,প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে তিনি ঔপনিবেশিক *য়ুনিভার্সিটি*-র যুগে দাঁড়িয়ে প্রাচীন ভারতের বিদ্যায়তনের সঙ্গে বিভিন্নভাবে তার পার্থক্য খুঁজেছেন।

রবীন্দ্র প্রত্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয় আসলে এক বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র। সে সাধনা বিদ্যার সাধনা। মূলত কোনো দেশ বা বিশেষ জাতি যে বিদ্যার সম্বন্ধে বিশেষ প্রীতি,গৌরব ও দায়িত্ব অনুভব করে এসেছে সেই বিশিষ্ট বিদ্যাকে রক্ষা ও প্রচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব। পাশাপাশি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য হল সর্বজনীন চিত্তের উদ্দীপন,উদ্বোধন ও চারিত্রসৃষ্টি। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের যে আদর্শ জ্ঞানে ও কর্মে ভারতের মনে উদ্ভাবিত হয়েছিল, তাকে সর্বসাধারণের জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়ার লক্ষ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। শুধু তাই নয়,জ্ঞানের তপস্যা উপলক্ষ্যে মানবমনের এমন বিশাল সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কোথায় বা সম্ভব। আসলে চিত্ত সম্পদ যাঁরা সৃষ্টি করেছেন কিংবা অর্জন করেছেন, তাঁদের সেই অর্জন করবার ও সৃষ্টি করবার পরম আনন্দে,সেই সম্পদ দেশ-বিদেশের সকলকে দান করবার একাগ্র বাসনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্নভাবে প্রাচীন ভারতের বিদ্যায়তনের সঙ্গে ঔপনিবেশিক *য়ুনিভার্সিটি-র* পার্থক্যকে স্পষ্ট করেছেন।

প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যানিকেতনে শুধু বিদ্যার সঞ্চয় নয়, বিদ্যার গৌরব ছিল প্রতিষ্ঠিত।তাই বাঙালি পণ্ডিত শীলভদ্রসহ প্রত্যেকেই আপন আপন পবিত্র অনিন্দনীয় চরিত্রের দ্বারা, নিবিড় কঠোর তপস্যার দ্বারা কিংবা সাত্বিক আদর্শের দ্বারা ছাত্রদের সেদিন কেবল প্রথাগত পাঠ নয়, জীবনের পাঠ দিতেন। ছাত্ররাও ছিল তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শ্রদ্ধাবান।

কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের *য়ুনিভার্সিটি* -তে ছাত্রদের কেবল পুঁথিগত শিক্ষার পাঠ দেওয়া হয়। ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদাতারা যেন কারখানার কারিগর। গাম্ভীর্যের মুখোশ পড়ে ছাপানো টেক্সটবুক থেকে নোট দেওয়া ছাড়া কোন ভূমিকাই আর তাঁদের নেই।রবীন্দ্রনাথ সতেরো বছর বয়সে লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে হেনরি মর্লির কাছে তিন মাসের জন্য ইংরেজি সাহিত্যের পাঠ নিয়েছিলেন।মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন,অধ্যাপক সাহিত্য পড়াতেন অন্তরতর রসটুকু দেওয়ার জন্য,শ্রেণিকক্ষে মূর্তিমান নোটবুকের মতো তাঁর ভূমিকা ছিল না। আবার সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়াকালীন ফাদার ডি পেনেরান্ডার মতো অধ্যাপককে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।ইংরেজি উচ্চারণ তাঁর স্পষ্ট ছিল না অথচ আন্তরিকতা ও উদারতায় তিনি ছিলেন অনন্য।তাঁর অন্তরে থাকা বৃহৎ মন তাঁকে সকলের চেয়ে আলাদা করেছিল। এভাবে অন্তর থেকে অন্তরে অবিশ্রাম উদ্যম সঞ্চার করার অভাবে ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষায় ছাত্ররা ছাঁচে ঢালা কৌশলী যন্ত্রে পরিণত হয়।ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার সঙ্গে রয়েছে মণিকাঞ্চন তথা অর্থের এবং স্তাবকতা তথা কর্তাভজা মানসিকতার সম্পর্ক,যা প্রকৃত শিক্ষা প্রদান ও অর্জনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে।এর পরিণাম কী ভয়ানক হতে পারে তা রবীন্দ্রনাথ *লিপিকা* -র অন্তর্গত *তোতাকাহিনী* শীর্ষক রচনাটিতে দেখিয়েছেন।যদিও

এরমধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল ১৯১৯ সালে শিক্ষাব্যাবস্থার উন্নতিকরণের জন্য গঠিত স্যাডলার কমিশনের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ।

প্রাচীন ভারতের বিদ্যায়তনের লক্ষ্য ছিল জ্ঞানের ভাণ্ডার পূরণ নয়,বরং জ্ঞানের তপস্যা অর্জন। তাই নিজের সম্পদকে বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া ও বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান চয়ন করে আপন কাজে লাগানো -- এই ছিল তার উদ্দেশ্য। অন্যদিকে, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের *য়ুনিভার্সিটি-তে* জ্ঞানের সঞ্চয়ের দিকটিতেই বিশেষভাবে ঝোঁক। জ্ঞানের বিষয় সংগ্রহ করার লোভ তার প্রবল, কিন্তু অর্জিত জ্ঞানকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার মতো উদারতা তার নেই। রবীন্দ্রনাথ তাই ঔপনিবেশিক শিক্ষাকে তুলনা করেছেন কুবেরের সম্পদের সঙ্গে আর প্রাচীন ভারতের বিদ্যায়তনকে বসিয়েছেন লক্ষ্মীর কল্যাণের আসনে।

নালন্দা,বিক্রমশীলা,তক্ষশীলা প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যানিকেতন সমস্ত পৃথিবীর আদর্শকে বিশুদ্ধ আর উন্নত রাখার দায়িত্বে চিরজাগরুক ছিল। নানা প্রকৃতির মন এখানে এক জায়গায় সমবেত হত।তাঁরা যদিও এক জাতের নয়, এক শ্রেণির নয়, কিন্তু তাঁদের লক্ষ্য ছিল একের দিকে। এই এক লক্ষ্যে দৃঢ় থেকে জ্ঞানের বিকাশসাধনেই ছিল তাঁদের মুক্তি।সেখানে শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিতে যথেষ্ট পরিমাণে কড়াকড়ি ছিল।কিন্তু 'ছাঁকনি'-র সূক্ষ্মতা নিয়ে কোনো সংশয় ছিল না। অপরপক্ষে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের *য়ুনিভার্সিটি* বিলিতি ছাঁচে ঢালা।সেখানে ইংরেজিই যাবতীয় বিদ্যা শিক্ষার প্রধান মাধ্যম,প্রাচ্যবিদ্যা ও সংস্কৃতির প্রতি অবহেলা সহজেই পরিলক্ষিত।আবার ছাত্র অন্তর্ভুক্তির গুণগত মান নিয়েও সেখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যায়।

প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যায়তনে বিদ্যাকে গ্রহণ করা হত অন্তরের তাগিদে,তপস্যার দ্বারা,সাধনার মাধ্যমে। কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতের *য়ুনিভার্সিটিতে* পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করা হয় জড় পদার্থের মতো বিশ্লেষণের দ্বারা, সমগ্র উপলব্ধির দ্বারা নয়। ছাত্ররাও তাই বিদ্যাকে অন্তর থেকে গ্রহণ করতে না পেরে নিছক প্রয়োজনের তাগিদে সিলেবাসমুখী হওয়াকেই বিদ্যার পাথেয় বলে মনে করে।

প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যায়তনে পরীক্ষার পদ্ধতিতে ফলের প্রতি যে দৃষ্টি ছিল তা সর্বতোভাবে অন্তরের সামগ্রী। কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে ফলের প্রতি যে আসক্তি তৈরি হল, তা বস্তুগ্রাহ্য- দৃষ্টিগ্রাহ্য ফল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তা আহরণ করা ফল, ফলন করা ফল নয়। সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে এর মূল্য অতি সামান্যই।

এই অচলাবস্থা থেকে মুক্তির জন্য ঔপনিবেশিক শিক্ষাঙ্গনকে তাই স্বদেশের আত্মায় গড়ে তুলতে হবে।শ্রদ্ধেয় আশুতোষের হাত দিয়ে যেমন বিলিতি ছাঁচের মধ্যেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবাহিত ছিল স্বদেশীয় ভাবধারা,তেমনি আজকেও স্বদেশের জল-মাটিতে পুষ্ট করে *য়ুনিভার্সিটি*-কে আক্ষরিকভাবেই বিশ্ববিদ্যার আলয়ে পরিণত করে তোলা চাই,এমনটাই চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।